বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি

ড. ষষ্ঠীচরণ ভট্টাচার্য

পুনশ্চ

প্রেক্ষাপট ও ভূমিকা আমার স্বীকারোক্তি

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র থাকা কালে বিশেষপত্র হিসাবে 'বৈষ্ণব সাহিত্য' পড়তে গিয়ে বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের বিস্তৃত পরিধি এবং বৈচিত্র্য আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। পাঠ্য তালিকা ভুক্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে পড়বার এবং জানবার আগ্রহ ছিল অপঠিত গ্রন্থগুলি, যা আধুনিক সাহিত্যের প্রাবল্যের মাঝে আজকের পাঠকের সামনে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রাবাসে থাকার সময় মাঝে মাঝে খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দির, পানিহাটির চিড়া-দধি মহোৎসব কিংবা বরাহনগর পাটবাড়ির রামদাস বাবাজীর স্মরণ উৎসব দর্শনে গিয়েছি। খড়দহের গোস্বামী, সাঁইবনার সেবাইত, পাটবাড়ির বৈষ্ণবদের বেশভূষা,আচার আচরন, কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়েছি। এদের সম্পর্কে আরও বেশি করে জানবার, এদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হবার বাসনা তখনই জেগেছিল, কিন্তু সংসারের চোরাবালির স্রোতে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় সে ইচ্ছা আর পূর্ণতা পায়নি। দীর্ঘ সময় পর যখনই অবকাশ পেয়েছি, তখনই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মাধ্যমে পরমশ্রদ্ধেয় ড. বিজিতকুমার দত্ত মহোদয়কে অবলম্বন করে বেরিয়ে পড়েছি সেই অপূর্ণ বাসনাকে চরিতার্থ করতে। পাঁচ বছরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার এই গ্রন্থ।

গবেষণার বিধি নির্ধারিত শুষ্ক নিয়মে যাতে বক্তব্য নীরস হয়ে না পড়ে সেদিকে যত্নশীল থাকার চেষ্টা করেছি। বিষয়বস্তুর সর্বাঙ্গীন বিচার এবং সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে নিরপেক্ষ মূল্যায়ণ করতে গিয়ে কারও বিশ্বাসে যদি সামান্যতম আঘাত দিয়ে থাকি তবে তা আমার অজান্তেই ঘটে গেছে, আমি ক্ষমাপ্রার্থী। সৃজনশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে ' শেষকথা' বলে কিছু থাকে না, সুতরাং পূর্বসূরিদের প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নবমূল্যায়ণের গ্রহণযোগ্যতা স্বীকৃত হবার প্রত্যাশা থেকেই যায়।

আমার প্রথম লক্ষ্যই ছিল সুপ্রাচীন পাটবাড়ি গুলির প্রতিষ্ঠাকাল, প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠাকালের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া; নানা ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে যে সব পাটবাড়ি টিকে আছে তাদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হওয়া; বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থায় পাটবাড়ির বৈষ্ণবদের প্রভাব অনুসন্ধান করা; সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে পাটবাড়ির অবদান অব্যাহত কিনা; বৈষ্ণব মহান্তদের,

সেবাইতদের জীবনযাত্রা, রীতি- নীতি সম্পর্কে অবগত হওয়া। সেইসঙ্গে জানতে চেয়েছি পাটবাড়ি গুলিতে আদর্শগত কোন বিকৃতি ঘটেছে কিনা, ঘটলে তার প্রকৃতি কেমন। বলা বাহুল্য অনুসন্ধানের মাঝে কখনও পুলকিত, কখনও ব্যথিত, কখনও বা তিরস্কৃত হয়েছি। সাহসে ভর করে দীর্ঘ সময় ধরে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শ্রম সাধিত অনুসন্ধান ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করেছি বর্তমান গ্রন্থে।

পশ্চিমবঙ্গের ১২ টি জেলা এবং বাংলাদেশের খুলনা, ফরিদপুর— এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মাঝে যখন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেসামাল হয়ে পড়েছি, ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়েছি, তখনই যাঁর স্নেহের শাসনে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি, আবার পথ চলা শুরু করেছি তিনি আমার পরম পূজনীয় অধ্যাপক ড.বিজিত কুমার দত্ত মহোদয়। গুরুর ঋণ শোধ করতে চাওয়ার ধৃষ্টতা আমার নেই, তাঁকে আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানাই। তাঁর স্নেহের রাংতায় মোড়া শাসন দণ্ডটি আমার কাছে বৈষ্ণবের কৃষ্ণলাভের সমান।

সংসারের গণ্ডীর মধ্যে আমার মা, আমার ধ্রুবতারা। অনন্ত লোকে যাবার অপেক্ষায় থাকা মাকে আমার শতকোটি প্রণাম। অফুরন্ত স্নেহের স্পর্শ পেয়েছি আমার পূজনীয়া অধ্যাপিকা ড. সুমিতা চক্রবর্তীর কাছে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এবং তারাবাগের কোয়াটার্সে আমার অনেক অত্যাচার নীরবে করেছেন অধ্যাপক ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা মহোদয়। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীআদ্যাশক্তি প্রসাদ রায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে চিরকৃতজ্ঞ করে রেখেছেন। এদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, প্রণাম জানাই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী দেবেন্দ্রকুমার লাহিড়ীকে। তাঁর অকৃত্রিম বাৎসল্য স্নেহের প্রাবল্যে ভেসে গেছে কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, তিনি আমাদের দেশে বৈষ্ণবীয় গবেষণার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী। অবসর গ্রহণের মাত্র দুদিন আগেও তিনি সানন্দে আমার একাধিক জিজ্ঞাসা পূরণ করে আমাকে চিরঋণী করে রেখেছেন।

একটানা পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে অনন্য মনে গবেষণা কাজে লিপ্ত থাকার অবকাশ দিয়েছেন আমার সংসার তরণীর সহযাত্রী শ্রীমতী অনিমা। আত্মীয় শ্রীঅশোক কুমার মুখার্জী বিভিন্ন দুর্গম স্থানে আমাকে সঙ্গ দিয়ে অকপটে অনেক কায়িক ক্লেশ স্বীকার করেছেন। তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি খুলনার অধিবাসী এবং স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোলদার এবং ফরিদপুর জগদ্বন্ধু মঠের প্রধান শ্রীপাদ মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্রজী এবং আশ্রমিক বন্ধু উৎসবানন্দ(গৃহাশ্রমে হীরালাল ভদ্র) জীকে। নিতান্ত অপরিচিত বিদেশের মাটিতে তাঁরা যে আতিথ্য দেখিয়েছেন তা বিস্মৃত হবার নয়।

কঠিন, জটিল, কাজের মাঝে বার বার যার আশীর্বাদ আমার উপর বর্ষিত হয়েছে তিনি নবদ্বীপ ধামেশ্বর গৌরাঙ্গ মন্দিরের সেবাইত প্রভুপাদ বিষ্ণুপ্রসাদ গোস্বামী। তার শ্রীচরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। শ্রীমান নিপুন গোলদার,কামনাশীষ মন্ডল যেমনওপার বাংলায় তেমনি ধীরাজ চক্রবর্তী, শ্রীমান বাঁটুল, স্মরজিৎ রায় এপার বাংলায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে আমার শ্রম লাঘব করেছে। এরা সকলেই আমার ছাত্র, এদের আমার আশীর্বাদ জানাই।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই সর্বশ্রী অমিয় কুমার দেববক্সী (কোচবিহার), পূর্ণচন্দ্র পানিগ্রাহী (মালদহ), সচ্চিদানন্দ গোস্বামী (ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ), ব্রজেন্দ্রনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী(গোপীবল্লভপুর), শ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী (তমলুক), প্রফুল্লকমল ঠাকুর (পুরুলিয়া), জীবশরণ দাস বাবাজী,প্রভাত চাঁদ গোস্বামী (বীরচন্দ্রপুর), ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় (মঙ্গলডিহি), অজিতকুমার ভট্টাচার্য (নানুর), বিজলী গোস্বামী (জীরাট), মানিক চাঁদ ঠাকুর (আনরবাটী), হরিকান্ত শরণ দেব ব্রজবাসী (কেন্দুলী),বীরেন্দ্রনাথ দেব (বিষ্ণুপুর), হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (ছাতনা), প্রশান্তকুমার গোস্বামী (শান্তিপুর), অটল বিহারী বাবাজী, শ্রীমতী রাধারানী দেবী (নবদ্বীপ) পদ্মনেত্র মহারাজ (ইসকন,মায়াপুর), কিশোরী দাস বাবাজী (হালিশহর), বৈদ্যনাথ গোস্বামী (খড়দহ), হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পানিহাটী) ,গণপতি ঘোষ, রামকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত গোস্বামী (কাটোয়া), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী (কালনা), কালিপদ অধিকারী (কুলীন গ্রাম) নেপাল দাস বৈরাগ্য (কান্দরা), স্মরজিৎ রায় (শ্রীখণ্ড), গিরিধারী দাস মহান্ত (ঝামটপুর), দীপ্তিময় গঙ্গোপাধ্যায় (বাঘনাপাড়া), প্রবীর কুন্ডু(দেন্দুর), পূর্ণচন্দ্র দাস মহান্ত (যাজি গ্রাম), মধুসূদন দাস বাবাজী (বরাহ নগর), প্রমুখ ব্যক্তিদের।

কাজটি সার্থকভাবে সমাধা করার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। ত্রুটি, অজ্ঞতা, শৈথিল্য, অনবধানতার পরিমান হয় তো অমার্জনীয়তার সীমা অতিক্রম করেনি। কৈফিয়ৎ দিয়ে দোষ স্খালনের চেষ্টা করবো না। অপরাধ স্বীকার করে পাঠকবর্গের প্রশ্রয় প্রার্থনা করছি। 'পুনশ্চ'-র শ্রীযুক্ত সন্দীপ নায়ক মহোদয় পাটীগনিতের লাভ লোকসানের উর্দ্ধে উঠে গ্রন্থ প্রকাশের দাযিত্ব গ্রহন করে আমাকে অশেষ ঋণী করেছেন। ... প্রেসের সত্ত্বাধিকারী ও কর্মীরাও আমার অনেক উৎপীড়ন সহ্য করেছেন। এদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

বিনীত

ড. ষষ্ঠীচরণ ভট্টাচার্য

সূ চি প ত্র

প্রথম অধ্যায় ১৩-১৪০

বর্ধমান — অগ্রদ্বীপ, অম্বিকানগর, কাটোয়া, কাঞ্চননগর, কুলীনগ্রাম, কান্দরা, দামালিয়া, ঝামটপুর, বড়বেলুন, বাঘনাপাড়া, দেনুড়, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, দধিয়া-বৈরাগীতলা, শীতলগ্রাম, পাঁচড়া, ভৈটা, নবগ্রাম।

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৪১-১৭০

বীরভূম — একচক্রা-বীরচন্দ্রপুর, কেন্দুবিল্ব, মঙ্গলডিহি, নানুর

তৃতীয় অধ্যায় ১৭১-১৮৮

বাঁকুড়া — বিষ্ণুপুর, ছাতনা, শ্রীনিবাস গৌড়ীয় মঠ

চতুর্থ অধ্যায় ১৮৯-২৪২

হুগলি— আনরবাটী (তড়া আটপুর), আদিসপ্তগ্রাম, কৃষ্ণপুর, খানাকুল— কৃষ্ণনগর, জিরাট, বল্লভপুর, ভেঁদো, মাহেশ

পঞ্চম অধ্যায় ২৪৩-২৫৮

মুর্শিদাবাদ— ভরতপুর, ডাঁহাপাড়া

ষষ্ঠ অধ্যায় ২৫৯-২৬৮

মালদহ—রামকেলি

সপ্তম অধ্যায় ২৬৯-২৭৬

কোচবিহার

অষ্টম অধ্যায় ২৭৭-২৯৪

মেদিনীপুর— গোপীবল্লভপুর, তমলুক

নবম অধ্যায় ২৯৫-৩০০

পুরুলিয়া—বেগুনকোদর

দশম অধ্যায় ৩০১-৩৩৮

উত্তর চব্বিশ পরগণা—খড়দহ, পানিহাটী, হালিশহর, সাঁইবনা, পালপাড়া

একাদশ অধ্যায় ৩৩৯-৩৪৮

কলিকাতা — বরাহনগর

দ্বাদশ অধ্যায় ৩৪৯-৩৯৮

নদীয়া— কাঁচড়াপাড়া, মায়াপুর, মায়াপুর গৌড়ীয় মঠ, শান্তিপুর, শ্রীধাম নবদ্বীপ

উপসংহার ৩৯৯-৪০৪

গ্রন্থপঞ্জী ৪০৫-৪১৬

নির্ঘন্ট ৪১৭-৪২৪

ব্যক্তি নির্ঘন্ট, স্থান নির্ঘন্ট

প্রথম অধ্যায়

বর্ধমান — অগ্রদ্বীপ, অম্বিকানগর, কাটোয়া, কাঞ্চননগর, কুলীনগ্রাম, কান্দরা, দামালিয়া, ঝামটপুর, বড়বেলুন, বাঘনাপাড়া, দেনুড়, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, দধিয়া-বৈরাগীতলা, শীতলগ্রাম, পাঁচড়া, ভৈটা, নবগ্রাম।

❖ অগ্রদ্বীপ ❖

॥ গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের শ্রীপাট ॥

"শ্রী কাশীশ্বর-গোবিন্দৌ তৌ জাতৌ প্রভুসেবকৌ"

কাশীশ্বর ও গোবিন্দ প্রভুর সেবক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন একথা সত্য কিন্তু চৈতন্য ভাগবতে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলায় তিনজন গোবিন্দের উল্লেখ আছে— গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্ত। একাধিক গোবিন্দের উল্লেখ অন্যত্রও আছে,—

"দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রী গোবিন্দানন্দ।।
.....
গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।"[১]

'ভক্তিরত্নাকর' -এ গোবিন্দানন্দের উল্লেখ নেই, 'ভক্তমাল'-এ গোবিন্দ দত্ত অনুপস্থিত। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-সঙ্গী মুরারি গুপ্তও কোথাও গোবিন্দানন্দ বা গোবিন্দ দত্তের উল্লেখ করেননি। কিন্তু গোবিন্দ ঘোষ প্রায় সর্বত্রই আছেন। এই গোবিন্দই বিখ্যাত বাসু ঘোষের ভ্রাতা ও কীর্তনীয়া। সংকীর্তনের মধ্য দিয়েই তিনি গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের স্নেহপাত্র হতে পেরেছিলেন। বহু ক্ষেত্রেই (বিশেষ করে জগন্নাথের রথযাত্রায়) গৌরাঙ্গের উদ্দণ্ড নৃত্যে যোগদানকারী গায়কদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা অনুসারে গোবিন্দ ঘোষের ভ্রাতৃপরিচয় দু'রকম।

প্রথমত ঃ

"গোবিন্দ রাঘব আর বাসুদেব ঘোষ।
তিন ভাই কীর্ত্তন করে প্রভুর সন্তোষ।।"[২]

আবার অন্যস্থানে ঃ

"আচার্যরত্ন বিদ্যানিধি শ্রীরাম রামাই।
বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই।।"[৩]

গোবিন্দ ঘোষের পিতা শ্রীবল্লভ ঘোষ মতান্তরে গোপাল ঘোষ মুর্শিদাবাদ জেলার রসোড়া গ্রামের বসবাস তুলে দিয়ে কাটোয়ার পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয় নদীর তীরে প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত বৈষ্ণব অধ্যুষিত কুলাই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কাটোয়ায় সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নিত্যানন্দের সঙ্গে কুলাই গ্রামের এক ক্রোশ দূরে অজয় নদীর উত্তর তীরে 'বিশ্রামতলা'য় বিশ্রাম করেন। স্থানীয় মানুষ বর্তমান বিশ্রামতলার একটি সুপ্রাচীন বটবৃক্ষকে চৈতন্যের বিশ্রামস্থল হিসাবে আজও বিশ্বাস করে চলেছেন।

১. চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য— ১৩, পৃ. ২৮৮।
২. ঐ, মধ্য — ১১, পৃ. ২৭২।
৩. চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য— ১৬, পৃ. ৩২৬।

এই কুলাই গ্রামেই চৈতন্যপ্রিয় গোবিন্দ ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। বল্লভ ঘোষ তিনবার দার পরিগ্রহ করেন। প্রথমা পত্নীর গর্ভে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব; দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে দনুজারি, কংসারি, মীনকেতন ও মুকুন্দ; তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে জগন্নাথ ও দামোদর—মোট নয় পুত্রের জন্ম হয়। 'বৈষ্ণব অভিধান' মতে বাসু, গোবিন্দ ও মাধব—তিন ভাই পরে কুমারহট্টে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং পরে বিদ্যার্জনের জন্য তিন জনেই নবদ্বীপে চলে আসেন। একটি সূত্র থেকে[৪] জানা যাচ্ছে বল্লভ ঘোষের নয় সন্তানই সঙ্গীতে দক্ষ ছিলেন এবং বেশ কয়েকজন মহাপ্রভু গঠিত সংকীর্তন দলে যুক্ত ছিলেন।

"গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্যনিতাই।।"[৪]

বৈষ্ণবাচার দর্পণে বলা হয়েছে—

"শ্রী গোবিন্দ ঘোষ বলি যাহার খেয়াতী।।
গৌরাঙ্গের শাখা অগ্রদ্বীপেতে নিবাস।
শ্রী গোপীনাথ ঠাকুর যাহার প্রকাশ।।"

এই প্রসঙ্গে ডঃ রমাকান্ত চক্রবর্তীর মন্তব্য —

" Nityananda requisitioned the services of three great Kirtana singers of the time. They were Madhava Ghosh, Govinda Ghosh and Vasudev Ghosh, three brothers of Navadvipa, who were intimately acquainted with Chaitanya."[৫]

অগ্রদ্বীপে শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে বিভিন্ন গ্রন্থে।[৬] এ সম্পর্কে সর্বাধুনিক বর্ণনা পাওয়া যায় বৈষ্ণব শ্রীপাট সম্পর্কে উৎসাহী বৈষ্ণব সমাজের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি শ্রীরবিন রাহার বর্ণনায়।[৭] দেনুড়ে নিত্যানন্দ বৃন্দাবন দাসের উপর যে লীলা করেন, মহাপ্রভু অগ্রদ্বীপে গোবিন্দ ঘোষের উপর ঠিক সেই লীলা করে এখানে শ্রীপাট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। পরবর্তী সময়ে গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে, বাসু তমলুকে ও মাধব দাঁইহাটের নিকটবর্তী গোপখাঁজী গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন করেন। আনুমানিক ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে অগ্রদ্বীপে শ্রী গোপীনাথের প্রতিষ্ঠা হয়। সে সময় বাংলার সিংহাসনে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৯) এবং দিল্লির সিংহাসনে সিকন্দর লোদী (১৪৮৮-১৫১৭) অধিষ্ঠিত।

'বিশ্বকোষ' কার বলেন— অগ্রদ্বীপের অনতিদূরে কাশীপুর বিষ্ণুতলা বা বৈষ্ণবতলায় ঘোষ ঠাকুরের বাস ছিল। কারও মতে বৈষ্ণবতলাই তাঁর জন্মস্থান। জনশ্রুতি প্রচলিত আছে শেষ সময়ে গোবিন্দ তাঁর দেহ দাহ না করে বর্তমান দোল-প্রাঙ্গণের পাশে সমাধি দিতে বলেছিলেন। এখনও কাশীপুর বৈষ্ণবতলায় ঘোষ ও সিংহ উপাধিধারী কয়েক ঘর উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থের বাস আছে। কার মতে মীনকেতনের উত্তরপুরুষ এখানে বসবাস করছেন। ঘোষ ঠাকুরের বার্ষিক শ্রাদ্ধ-দিনে আজও মধুসূদন, পঞ্চানন, কালো, অচিন্ত, নবকুমার ঘোষ প্রমুখ অশৌচাদি পালন, ক্ষৌরাদি কর্ম পালন করে গোবিন্দ ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

৪. বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী ঃ মুরারিলাল অধিকারী।
৫. Vaisnavism in Bengal, P. 151: Dr. Ramakanta Chakraborty.
৬. বৈষ্ণবদিগদর্শনী, পৃ. ৫৯-৬১, চৈতন্য পরিকর (ডঃ মাইতি), পৃ. ২৭১-৭৩, 'জন্মভূমি' পত্রিকায় (১২৯৮ সালে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) অঘোরনাথ দত্ত।
৭. অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ কাহিনী ঃ রবিন রাহা।

অগ্রদ্বীপ গোপীনাথের সেবাপূজা সংক্রান্ত ইতিহাস ঃ

ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কৃষ্ণনগরের মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র অগ্রদ্বীপ মৌজা লাভ করেন উপঢৌকন হিসাবে। একবার মহারাজ গোপীনাথ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সেবা-বাসনা মনের মধ্যে সঞ্চয় করলেন। গোবিন্দ ঘোষের (আপন একমাত্র পুত্র অকালে মারা যান) বংশধরদের প্রাচীন মন্দির ছিল বর্তমান গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে 'বামাসুন্দরী' মাঠের সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের সন্নিকটস্থ দহে (বর্তমানে জলাশয়)। উক্ত দহটি আজও প্রাচীন মন্দিরের স্মৃতি বহন করছে। মন্দির সংলগ্ন মাঠে গোপীনাথের দোল বারুণী উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হতো। বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থী গোপীনাথের পিণ্ডদান দর্শন করতে হাজির হতেন বামাসুন্দরী মাঠে। তখনকার সেবাইত ছিলেন মীনকেতনের বংশধরগণ। কথিত আছে যে স্থানে বসে শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবিন্দ ঘোষের গোপীনাথকে প্রতিষ্ঠা করেন, সেই জায়গায় গোবিন্দের বংশধরগণ আজ থেকে ৪৭৫ বছর আগে মন্দির তৈরি করেন। ঐ মন্দিরেই ২৭৫ বছর গোপীনাথের সেবাপূজা চলতে থাকে। বাংলা ১১৮০-৮৫ সালে বার্ষিক দোল-বারুণী উপলক্ষে মেলায় একবার ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হয়। সেই দাঙ্গায় অনেক তীর্থযাত্রীর প্রাণ যায়। ইংরেজ সরকার সেবাইতদের বিরুদ্ধে আদালতে খুনের মামলা দায়ের করেন। নিরুপায় সেবাইতগণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্মরণাপন্ন হলে মহারাজ তাঁর সুপ্ত বাসনার বশবর্তী হয়ে সেবাইতের উপর একটি শর্ত আরোপ করেন। উক্ত খুনের মামলার দায়দায়িত্বের পরিবর্তে মহারাজ গোপীনাথের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার পেতে চাইলেন। সেবাইতগণ মামলার হাত থেকে বাঁচলেন তাঁদের কুলদেবতাকে চিরকালের জন্য বন্ধক রেখে। ইতিমধ্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরের দহের পুরাতন মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হবার পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অগ্রদ্বীপ মৌজার ১৫৪৭ দাগ নম্বরভুক্ত ১৯ শতক জমির উপর নতুন মন্দিরটি বহু অর্থব্যয়ে বাংলা ১১৮৯ সালের মধ্যে তৈরি করান।[৮]

অন্য একটি সূত্র [৯] থেকে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্য-শিষ্য গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর অগ্রদ্বীপের শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউ-এর মন্দির নির্মাণ করেন। ঘোষ ঠাকুরের আমলের মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১১৮৯ সালের ১২ই আষাঢ় পরলোক গমন করেন। জীবিতকালে তিনি মন্দিরের সেবাপূজার জন্য বহু অর্থ ও ভূসম্পত্তি দান করেন। পূর্বোক্ত সম্পত্তির বাৎসরিক আয় থেকে নিত্য সেবার জন্য দৈনিক ১০১ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল।

আজ থেকে ৭০-৭৫ বছর আগের প্রত্যক্ষদর্শী, বর্তমান কাটোয়া (গৌরাঙ্গ পাড়া) নিবাসী শ্রীগণপতি ঘোষ (ভক্তিভারতী)-এর প্রদত্ত বিবরণ ঃ

শ্রীমন্দিরের চারদিকে তখন ভগ্নদশা। ১৩০৭ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে মন্দিরের চারদিকের প্রাচীর, অতিথিশালা, বৈষ্ণবখণ্ড—সব ধূলিসাৎ। ঘোষ ঠাকুরের বর্তমান সমাধিমন্দির ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে 'অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ সেবা সমিতি' পুনর্নির্মাণ করেন। জনশ্রুতি—প্রাচীন সমাধিমন্দির (যা গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত ছিল) হতে 'পবিত্র রজ' এনে পিণ্ডদান ক্ষেত্র বা শ্রাদ্ধবাসর ক্ষেত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই নির্মাণ করেন। গোবিন্দ ঘোষের স্মৃতি বিজড়িত 'সমাধিমন্দির' বৈষ্ণবদের কাছে পবিত্র পুণ্যতীর্থ ও বৈষ্ণব মিলনতীর্থ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষ সমাধি মন্দিরের 'রজে' গড়াগড়ি দিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেন।

---

৮. কৃষ্ণনগর রাজবাটী সূত্রে প্রাপ্ত।

৯. 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত': অধ্যায় — ১৮।

"মহাপাট অগ্রদ্বীপ জানিবা ভক্তগণ
দুই তিন ভক্ত বাসে মহাপাটাখ্যান।।
অগ্রদ্বীপ তিন ঘোষ লভিলা জনম।
সেই হেতু মহাপাট কহে ভক্তগণ।।"[১০]

শ্রীপাট সমূহের মধ্যমণি অগ্রদ্বীপ তাই আজও হাজার হাজার ভক্তকে আকৃষ্ট করে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্যোগে নির্মিত পুরাতন মন্দিরের নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা কাল ১৪০০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত মন্দিরের পশ্চিমদিকের দেওয়ালে উৎকীর্ণ ছিল কিন্তু বর্তমান সংস্কৃত মন্দিরে তা ঢাকা পড়ে যাওয়ায় সঠিক সময়কাল উদ্ধার করা যায়নি। মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ বিগ্রহের সেবাপূজার সুবন্দোবস্ত করে যান কিন্তু কালের প্রভাবে তার অনেক কিছুই আজ লুপ্ত।

জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী থেকে অধুনা গোপীনাথের বার্ষিক সেবাপূজার জন্য নিলামের মত একটা অভিনয় করিয়ে রাজবংশের সেবাইত শরিক বর্তমান পূজারিকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা কবুল করিয়ে 'কবলয়তিপত্র' স্বাক্ষর করিয়ে গোপীনাথের বার্ষিক সেবাপূজার জন্য ছাড়পত্র দেন।[১১]

গোপীনাথ সারা বছর অগ্রদ্বীপ মন্দিরে বিরাজ করেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যে নিয়ম চলে আসছে তা হল ঃ

চৈত্র মাসে অগ্রদ্বীপ মন্দিরে গোপীনাথের দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পরের একাদশীতে অনুষ্ঠিত হয় ঘোষ ঠাকুরের বার্ষিক শ্রাদ্ধোৎসব। উৎসব শেষে গোপীনাথজি এবার কৃষ্ণনগর যাত্রা করেন। কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে বার দোল উৎসব ও মেলার তিনদিন বিগ্রহকে কৃষ্ণনগর মন্দিরে রাখা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণনগর থেকে নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী থানার অন্তর্গত গোটপাড়া (গোষ্ঠপাড়া) গ্রামে জগন্নাথের স্নানযাত্রার দিনে গোপীনাথেরও স্নান হয়। সেখান থেকে পুনরায় অগ্রদ্বীপের মন্দিরে ফিরলে কয়েকদিন বিশেষ সেবাপূজা নাম সংকীর্তন ও বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু গত ২৫। ৩০ বছর যাবৎ তা বন্ধ। এখন গোটপাড়া থেকে বিগ্রহ আবার কৃষ্ণনগরে (ভক্তের দৃষ্টিতে মথুরায়) ফিরিয়ে আনা হয়। রাজবাড়ি মন্দির থেকে রথে গোয়ারী গমন এবং পুনর্যাত্রান্তে আবার রাজবাড়ি মন্দির। শারদোৎসবের আগে সেখান থেকে নদীপথে সুসজ্জিত নৌকাযোগে পূর্বস্থলী, মেড়তলা, তামাঘাট, লক্ষ্মীপুর, পাটুলী, বহরা, গাজীপুরের ঘাটে ঘাটে অগণিত ভক্তদের দর্শন দিতে দিতে অগ্রদ্বীপের মন্দিরে উপস্থিত হন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে ১৯৯৫ খ্রিঃ পর্যন্ত গোপীনাথের গমনাগমন জলপথেই নৌকাবিহার করতে দেখা গেল। স্থানীয় ভক্তের চোখে গোপীনাথের এই বিশেষ যাত্রালীলা, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলারই এক বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসের পুনরাভিনয় লীলা যাত্রা।

গোপীনাথের নিত্যপূজা ভোগ ঃ মঙ্গলারতি বা বাল্য ভোগের কোনো ব্যবস্থা বর্তমানে আমরা প্রত্যক্ষ করিনি, যা অতীতে ছিল বলে শোনা গেছে। বর্তমানে ৯-টার সময় মন্দির খোলা হয়, পরে স্নান, বস্ত্রসেবা, পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নিত্য পূজার উপচার নিতান্ত সাধারণ (ভক্ত পূজা দিলে অন্য কথা)। দুপুরে পঞ্চব্যঞ্জনযোগে অন্নভোগ, শয়ন। বিকালে গাত্রোত্থান

১০. অভিরাম দাস কৃত শ্রীপাট পর্য্যটন।

১১. উক্ত তথ্য রাজপরিবার ও পুরোহিত অস্বীকার করলেও অগ্রদ্বীপের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই একই কথা বলেছেন।

ও বৈকালিক ভোগ। সন্ধ্যায় আরতি, নামগান, ভোগ (অন্ন ব্যতীত), শয়ন। রাত্রি ৮ টার মধ্যে মন্দির বন্ধ। মূল মন্দির সংলগ্ন শিবমন্দিরের সেবার দায়িত্বও একই কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হয়। এর থেকে বোঝা যায়— বৈষ্ণবদের সঙ্গে শৈবদের সংঘাত ছিল না; পরস্পরে হাত মিলিয়ে চলতেন। দৈনিক পূজা ভোগের জন্য (উৎসব বাদে) ১০০ টাকা হিসাবে বরাদ্দ থাকলেও বেশ কয়েকদিন খুব কাছ থেকে সারাদিনের পূজা ভোগ প্রত্যক্ষ করে আমাদের বিশ্বাস, ওই খরচ ৫০ টাকার ঊর্ধ্বে যায় না।

উৎসব ঃ অগ্রদ্বীপ মন্দিরে বিগ্রহ থাকাকালীন প্রধান উৎসব চৈত্র কৃষ্ণা-একাদশী তিথিতে গোবিন্দ ঘোষের বাৎসরিক শ্রাদ্ধোৎসব। শোনা যায় গোবিন্দ ঘোষের অপ্রকট হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই উৎসব চলে আসছে। ১৪০১ সালে এই উৎসবের সূচনা হতে দেখলাম ১২-ই চৈত্র। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবে কয়েক লক্ষ ভক্ত, দর্শনার্থী পর্যটক (বিদেশী পর্যটকদেরও দেখা গেছে) সমবেত হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তদের সমাগম তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অপ-সম্প্রদায় যেমন আউল, বাউল, দরবেশ, কর্তাভজা—এরা সমগ্র গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে আখড়া করে নারী-পুরুষ মিলে দেহতত্ত্ব, বাউল গানে, একতারা বাজিয়ে, নূপুরের ছন্দে সমগ্র এলাকা মাতিয়ে তোলেন। তবে দেখে শুনে মনে হয়, গোপীনাথ নয়—মনের মানুষ এবং দেহই হল এদের উপাস্য। ভোগবাদ — কামবাদ অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণবধর্মে অবক্ষয়, বৈষ্ণবের নিম্নরুচির প্রকাশ ঘটল। কিশোরী ভজনার তত্ত্বকে তাঁরা বিকৃত করলেন।

ভোগের বিশেষ ব্যবস্থা ঃ নবান্নের (অগ্রহায়ণ মাসে) দিন থেকে দোলযাত্রা পর্যন্ত রাজভোগে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ভোগে খিচুড়ি ও পরমান্ন ভোগ দেওয়া হয়। জনৈক তুলসী ঘোষের মায়ের সুবাদে দৈনিক রাত্রির মুড়কি বাতাসা ভোগের সঙ্গে ক্ষীর-ছানা যুক্ত হয়। কোনো ভক্ত দুপুরে প্রসাদ পেতে চাইলে (নিয়মিত দু'একজন থাকেনই) ভিক্ষার আনুকূল্যে পেতে পারেন তবে মন্দির খোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই তা জানিয়ে দিতে হয়।

এছাড়া ঝুলন, রাস, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি উৎসবে বিশেষ পূজা-ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। নিত্য যথারীতি পূজাভোগ হয়, কাঁসর-ঘণ্টা বাজে, দৈনিক কিছু না কিছু ভক্ত আসেনই। তবু সব কিছুতেই যেন প্রাণের অভাব, কেবল যেন নিয়মের অনুশীলন।

১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীগণপতি ঘোষ (ভক্তিভারতী) -এর উদ্যোগে এবং অগ্রদ্বীপ রাধাকান্ত মন্দিরের অন্যতম সেবাইত ৺বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অগ্রদ্বীপে এক বৈষ্ণব মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিয়ম-নিষ্ঠা প্রচার, চব্বিশ প্রহর নামযজ্ঞ, চৌষট্টি মহান্তের ভোগরাগ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শ্রীপাটের গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্ত এবং নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কাটোয়া, কালনা, শ্রীখণ্ড, খড়দহ, নোতা ইত্যাদি শ্রীপাটের গোস্বামী ও আচার্য সন্তানগণ গোপীনাথ মন্দিরে সমবেত হয়ে সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। এই সম্মেলন থকে ষট্ গোস্বামীর মত ও পথ বহুল প্রচার শুরু হয়। ওই সময় পর্যন্ত শ্রীপাটের আয়-ব্যয়ের একটা সুষ্ঠু হিসাব ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের নিবন্ধকরণ আইন অনুসারে 'গোপীনাথ সেবা সমিতি' রেজিস্ট্রিকৃত ছিল এবং কাটোয়া স্টেট ব্যাঙ্কে সমিতির নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট ছিল। কিন্তু তার পরই নতুন পরিচালন সমিতি প্রায় জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করা থেকে গোপীনাথের নামে ব্যক্তিস্বার্থ প্রকট হয়ে ওঠে। বর্তমানে বাৎসরিক উৎসবে আয় বারো হাজার টাকা কিংবা তারও বেশি। ছয় বিঘা জমির ফসলের আয়, ভক্তের দান— সব মিলিয়ে আয় নিতান্ত কম নয় তবু স্থানীয় মানুষজনের মতে সেবাপূজার আড়ম্বর ও নিষ্ঠা দুই-ই ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।